কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৫

প্রস্তুতি সহায়ক তাফসীর নোট পর্বঃ ১১

সূরা জাসিয়াহ ১২-২১ আয়াত

اَللّٰهُ الَّذِیْ سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِیَ الْفُلْكُ فِیْهِ بِاَمْرِهٖ وَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

১২. আল্লাহ, যিনি সাগরকে তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন, যেন তাঁর আদেশে তাতে নৌযানসমূহ চলাচল করতে পারে। আর যেন তোমরা তাঁর অনুগ্রহ তালাশ করতে পার এবং যেন তোমরা (তাঁর প্রতি) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নিয়ামতের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তাঁরই হুকুমে মানুষ তাদের ইচ্ছানুযায়ী সমুদ্রে সফর করে থাকে। মালভর্তি বড় বড় নৌযানগুলো নিয়ে তারা এদিক হতে ওদিক ভ্রমণ করে। তারা ব্যবসা-বাণিজ্য করে আয়-উপার্জন করে থাকে। সমুদ্রে নৌকা ও জাহাজসমূহের গমনাগমন তোমাদের কৃতিত্ব ও দক্ষতার ফল নয়, বরং এটা চলে আল্লাহর নির্দেশ ও তাঁর ইচ্ছায়। তা নাহলে তিনি ইচ্ছা করলে সমুদ্র-তরঙ্গে এমন উত্তাল অবস্থা সৃষ্টি করে দেবেন যে, কোন নৌকা ও জাহাজ তার পৃষ্ঠে স্থির থাকতে পারবে না। যেমন কখনো কখনো তিনি তাঁর মহাশক্তির (কিঞ্চিৎ) বিকাশ ঘটানোর জন্য এ রকম করে থাকেন। যদি অব্যাহতভাবে তরঙ্গ উত্তাল অবস্থায় থাকে, তবে তোমরা কখনোও সমুদ্রে সফর করার সুযোগই পাবে না।

পবিত্র কুরআনে 'অনুগ্রহ তালাশ করা' এর অর্থ সাধারণত জীবিকা উপার্জনের চেষ্টা প্রচেষ্টা হয়ে থাকে। এখানে এরূপ অর্থ হতে পারে যে, তোমাদেরকে সমুদ্রে জাহাজ চালনার শক্তি দেয়া হয়েছে, যাতে তোমরা ব্যবসা বাণিজ্য করতে পার। এরূপ অর্থও সম্ভবপর যে, সমুদ্রে আমি অনেক উপকারী বস্তু সৃষ্টি করে সমুদ্রকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছি, যাতে তোমরা সেগুলো খোজ করে উপকৃত হও।

এ সব কিছুই এই জন্য করেছেন যে, যাতে তোমরা এই নিয়ামতসমূহের উপর আল্লাহর শুকরিয়া আদায় কর, যে নিয়ামতসমূহ সমুদ্রকে তোমাদের আয়ত্তে করে দেওয়ার ফলে অর্জিত হয়।

وَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا مِّنْهُ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یَّتَفَكَّرُوْنَ

১৩. আর তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন আসমানসমূহ ও যমীনের সমস্ত কিছু নিজ অনুগ্রহে, নিশ্চয় এতে অনেক নিদর্শনাবলী রয়েছে, এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা চিন্তা করে।

এ আয়াতাংশের দু'টি অর্থ। একটি অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর এই দান দুনিয়ার বাদশাহদের দানের মত নয়। কেননা, তারা প্রজার নিকট থেকে নেয়া সম্পদ প্রজাদেরই কিছু লোককে দান করে থাকে। বিশ্বজাহানের সমস্ত সম্পদ আল্লাহর নিজের সৃষ্টি। তিনি নিজের পক্ষ থেকে তা মানুষকে দান করেছেন। আরেকটি অর্থ হচ্ছে, এসব নিয়ামত সৃষ্টি করার ব্যাপারে যেমন কেউ আল্লাহর শরীক নয়, তেমনি মানুষের জন্য এগুলোকে অনুগত করার ব্যাপারেও অন্য কোন সত্তার কোনো প্রকার দখল বা কর্তৃত্ব নেই। আল্লাহ একাই এ সবের স্রষ্টা এবং তিনিই নিজের পক্ষ থেকে তা মানুষকে দান করেছেন।

নিশ্চয় এতে অনেক নিদর্শনাবলী রয়েছে, এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা চিন্তা করে- অর্থাৎ অনুগতকরণে এবং এসব জিনিসকে মানুষের জন্য কল্যাণকর বানানোর মধ্যে চিন্তাশীল লোকদের জন্য বড় বড় নিদর্শন রয়েছে। এসব নিদর্শন পরিষ্কারভাবে এ সত্যের প্রতি ইঙ্গিত দান করছে যে, পৃথিবী থেকে আসমান পর্যন্ত বিশ্বজাহানের সমস্ত বস্তু এবং শক্তির

স্রষ্টা, মালিক, প্রশাসক ও ব্যবস্থাপক একমাত্র আল্লাহ, যিনি সব কিছুকেই একটি নিয়ম-বিধির অনুগত করে রেখেছেন এবং সেই আল্লাহই মানুষের রব-যিনি তাঁর অসীম ক্ষমতা, জ্ঞান ও কৌশল এবং রহমতে এসব বস্তু ও শক্তিসমূহকে মানুষের জীবন, জীবিকা, আয়েশ-আরাম, উন্নতি ও তাহযীব-তমদ্দুনের উপযোগী ও সহায়ক বানিয়েছেন এবং একা তিনিই মানুষের দাসত্ব, কৃতজ্ঞতা ও আনুগত্য লাভের অধিকারী। অন্য সত্তাসমূহ এসব বস্তু ও শক্তি সৃষ্টিতে যাদের কোন অংশ নেই কিংবা এসব বস্তু ও শক্তি মানুষের অনুগত করা ও কল্যাণকর বানানোর ক্ষেত্রে যাদের কোন কর্তৃত্ব নেই, মানুষের দাসত্ব, কৃতজ্ঞতা ও আনুগত্য লাভের অধিকারও তাদের নেই।

قُلْ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَغْفِرُوْا لِلَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ اَيَّامَ اللّٰهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

১৪. যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে বলুন, তারা যেন ক্ষমা করে ওদেরকে, যারা আল্লাহর দিনগুলোর প্রত্যাশা করে না। যাতে আল্লাহ প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাদের কৃতকর্মের জন্য প্রতিদান দিতে পারেন।

মূল আয়াতাংশ হচ্ছে لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ । এর শাব্দিক অনুবাদ হবে, "যেসব মানুষ আল্লাহর দিনসমূহের আশা রাখে না।" কিন্তু আরবী বাকরীতিতে এ রকম ক্ষেত্রে اَيَّام অর্থ শুধু দিন নয়, বরং এমন সব স্মরনীয় দিন যখন গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহ সংঘটিত হয়েছে। যেমন اَيَّامُ الْعَرَبْ শব্দ আরব ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী এবং আরব গোত্রসমূহের এমন সব বড় বড় যুদ্ধ-বিগ্রহ বুঝানোর জন্য বলা হয় যা পরবর্তী বংশধররা শত শত বছর ধরে স্মরণ করে আসছে। এখানে اَيَّامُ اللهِ অর্থ কোন জাতির জীবনের সর্বাধিক অকল্যাণকর দিন, যেদিন তাদের ওপর আল্লাহর গযব নেমে আসে এবং নিজ কৃতকর্মের পরিণামে তাদের ধ্বংস করে দেয়া হয়। এই অর্থ অনুসারে আমরা এই আয়াতাংশের অনুবাদ করেছি, 'যারা আল্লাহর পক্ষে থেকে ভয়াবহ দিন আসারআশঙ্কা করে না। অর্থাৎ যাদের এ চিন্তা নেই যে, কখনো এমন দিনও আসতে পারে যখন আমাদের এসব কাজ-কর্মের ফলশ্রুতিতে আমাদের জন্য দুর্ভাগ্য নেমে আসবে। এই উদাসীনতাই তাদেরকে জুলুম-অত্যাচারের ব্যাপারে দুঃসাহস যুগিয়েছে।

যাতে আল্লাহ প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাদের কৃতকর্মের জন্য প্রতিদান দিতে পারেন- মুফাসসিরগণ এ আয়াতের দু'টি অর্থ বর্ণনা করেছেন। আয়াতের শব্দাবলী থেকে এ দু'টি অর্থ গ্রহণেরই অবকাশ আছে। একটি অর্থ হচ্ছে, মু'মিনদেরকে এ জালেম গোষ্ঠীর অত্যাচার উপেক্ষা করতে হবে যাতে আল্লাহ তাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে তাদের ধৈর্য ও মহানুভবতা এবং শিষ্টাচারের প্রতিদান দেন এবং তারা আল্লাহর পথে যে দুঃখ-কষ্ট বরদাশত করেছে তার পুরস্কার দান করেন।আরেকটি অর্থ হচ্ছে, মু'মিনগণ যেন, এই গোষ্ঠীকে উপেক্ষা করে যাতে আল্লাহ নিজেই তাদের অত্যাচারের প্রতিফল দান করেন।

কতিপয় মুফাসসির এ আয়াতকে 'মনসূখ' বলে আখ্যায়িত করেছেন। তারা বলেনঃ যতদিন মুসলমানদের যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়নি ততদিন এ আদেশ বহাল ছিল। কিন্তু যুদ্ধের অনুমতি দেয়ার পর এ হুকুম 'মনসূখ' হয়ে গিয়েছে। তবে আয়াতের শব্দসমূহ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মনসুখ হওয়ার এ দাবী ঠিক নয়। ব্যক্তি যখন কারো জুলুমের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে সক্ষম নয় তখন তাকে ক্ষমা করে দেয়া অর্থে এই 'মাফ' শব্দটি কখনো ব্যবহৃত হয় না। বরং এক্ষেত্রে ধৈর্য, সহ্য ও বরদাশত শব্দগুলো প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। এ শব্দগুলো বাদ দিয়ে এখানে যখন 'মাফ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তখন আপনা থেকেই তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ঈমানদারগণ সেই সব লোকের জুলুম ও বাড়াবাড়ির জবাব দেয়া থেকে বিরত থাকবে আল্লাহর ব্যাপারে নির্ভীক হওয়া যাদেরকে নৈতিকতা ও মনুষ্যত্বের সীমালংঘনের দুঃসাহস যুগিয়েছে। যেসব আয়াতে মুসলমানদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়েছে তার সাথে এ নির্দেশের কোন অমিল বা বৈপরীত্য নেই। যুদ্ধের অনুমতি দানের প্রশ্নটি এমন অবস্থার সাথে সম্পর্কিত যখন কোন কাফের কওমের বিরুদ্ধে যথারীতি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মুসলিম সরকারের কাছে যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে। আর ক্ষমার নির্দেশ এমন সাধারণ পরিস্থিতির সাথে সম্পর্কিত যখন কোন না কোনভাবে মু'মিনদের সম্মুখীন হতে হয় আল্লাহর ভয়ে ভীত নয় এমন সব লোকদের এবং তারা তাদের বক্তব্য, লেখনী ও আচার-আচরণ দ্বারা মু'মিনদেরক নানাভাবে কষ্ট দেয়। এ নির্দেশের উদ্দেশ্য হলো, মুসলমানরা যেন তাদের উচ্চতর আসন থেকে নেমে এসব হীন চরিত্র লোকদের সাথে

ঝগড়া-বিবাদে জড়িয়ে পড়ে এবং তাদের প্রতিটি অর্থহীন কাজের জবাব দিতে শুরু না করে। যতক্ষণ পর্যন্ত শিষ্টতা ও যৌক্তিতার সাহায্যে কোন অভিযোগ ও আপত্তির জবাব দেয়া কিংবা কোন জুলুমের প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তা থেকে বিরত থাকা উচিত নয়। কিন্তু যখনই এ সীমা লংঘিত হবে তখনই সেখানেই ক্ষান্তি দিয়ে ব্যাপারটি আল্লাহর কাছে সোপর্দ করতে হবে। মুসলমানরা নিজেরাই যদি তাদের মোকাবিলায় ময়দানে নেমে পড়ে তাহলে আল্লাহ তাদের সাথে মোকাবিলার ক্ষেত্রে মুসলমানদেরকে তাদের আপন অবস্থার ওপর ছেড়ে দেবেন। কিন্তু তারা যদি ক্ষমা ও উপেক্ষার নীতি অনুসরণ করে তাহলে আল্লাহ নিজেই জালেমদের সাথে বুঝাপড়া করবেন এবং মজলুমদেরকে তাদের ধৈর্য ও মহানুভবতার পুরস্কার দান করবেন।

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ اَسَآءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ

১৫. যে সৎকাজ করে সে তার কল্যাণের জন্যই তা করে এবং কেউ মন্দ কাজ করলে তা তারই উপর বর্তবে, তারপর তোমাদেরকে তোমাদের রবের দিকেই প্রত্যাবর্তিত করা হবে।

‘যে সৎ কাজ করবে, সেটা সে নিজের কল্যাণের জন্যেই করবে। আর যে খারাপ কাজ করবে। সে নিজের অকল্যাণের জন্যই করবে। এরপর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে ফিরে যাবে।’ এর দ্বারা মুমিনের বুকটা বড় হয়ে যায়। তার মনোবল বেড়ে যায়। ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠিগত অনাচার ও অত্যাচার হাসিমুখে সয়ে নেয়। কারও প্রতি কোনো দুর্বলতা প্রকাশ করে না, কোনো বিরক্তি প্রকাশ করে না। কারণ, সে আদর্শের দিক থেকে বড়, মনের দিক থেকে বড় এবং শক্তির দিক থেকে বড়। সে হেদায়াতের মশালবাহী, তার হাতে রয়েছে মৃতসঞ্জীবনী । তার কাজের জন্যে সে নিজে দায়ী। অন্য কোনো অপরাধের ভাগী সে হবে না। সর্বশেষ বিচার আল্লাহর হাতে। তারই কাছে সকলকে ফিরে যেতে হবে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন : “তোমরা সৎ কর্ম করলে সৎ কর্ম নিজেদের জন্য করবে এবং মন্দ কর্ম করলে তাও করবে নিজেদের জন্য।” (সূরা বানী ইসরাঈল ১৭ : ৭)

সুতরাং যে সকল ব্যক্তি তাদের অনুসারী বা মুরীদদের অপরাধের বোঝা বহন করার আশ্বাস প্রদান করে তাদের প্রদত্ত আশ্বাস অনর্থক। আল্লাহ তা‘আলা বলেন : “প্রত্যেকে স্বীয় কৃতকর্মের জন্য দায়ী এবং কেউ অন্য কারো (পাপের) ভার গ্রহণ করবে না।” (সূরা আন‘আম ৬ : ১৬৪)

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ

১৬. আর অবশ্যই আমরা বনী ইসরাঈলকে কিতাব, কর্তৃত্ব ও নবুওয়াত দান করেছিলাম এবং তাদেরকে রিযিক প্রদান করেছিলাম উত্তম বস্তু হতে, আর দিয়েছিলাম তাদেরকে সকল সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব।

হুকুম শব্দের কয়েকটি অর্থ হতে পারে। এক-কিতাবের জ্ঞান ও উপলব্ধি এবং দ্বীনের অনুভূতি। দুই-কিতাবের অভিপ্রায় অনুসারে কাজ করার কৌশল। তিন-বিভিন্ন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতা। চার-ক্ষমতা বা রাজত্ব।

বানী ইসরাঈলের উপর পরম করুণাময় আল্লাহর যেসব নিয়ামত ছিল এখানে তিনি তারই বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনি তাদের উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছিলেন, তাদের কাছে রাসূল পাঠিয়েছিলেন এবং তাদেরকে হুকুমত দান করেছিলেন। আর ঐ যুগের লোকদের উপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলেন। দ্বীন সম্পর্কীয় উত্তম ও স্পষ্ট দলীল তিনি তাদের কাছে পৌছিয়ে দিয়েছিলেন। তাদের উপর আল্লাহর হুজ্জত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু তাদের নিকট জ্ঞান আসার পর তারা শুধু পরস্পর বিদ্বেষ বশতঃ বিরোধিতা করেছিল এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল।

وَاٰتَيْنٰهُمْ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۭ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ

১৭. আর আমরা তাদেরকে দ্বীনের যাবতীয় বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি দান করেছিলাম। তাদের কাছে জ্ঞান আসার পরও তারা শুধু পরস্পর বিদ্বেষবশতঃ মতবিরোধ করেছিল। তারা যে সব বিষয়ে মতবিরোধ করত, নিশ্চয় আপনার রব কিয়ামতের দিন তাদের মধ্যে সে সব বিষয়ে ফয়সালা করে দিবেন।

অর্থাৎ, হালাল ও হারাম বিবৃত স্পষ্ট বিধান। অথবা মু'জিযা ও অলৌকিক ঘটনাবলী। কিংবা নবী (সাঃ)-এর আগমনের জ্ঞান। তাঁর নবী হওয়ার প্রমাণাদি এবং নির্দিষ্টভাবে সেই স্থানের জ্ঞান, যেখানে তিনি হিজরত করে যাবেন।

بَغْيًا بَيْنَهُمْ এর অর্থ, আপোসে একে অপরের প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষবশতঃ অথবা খ্যাতি ও পদমর্যাদা লাভের জন্য জ্ঞান আসার পর তারা তাদের দ্বীনের ব্যাপারে মতবিরোধ অথবা রসূল (সাঃ)-এর রিসালাতকে অস্বীকার করল। হকপন্থীদেরকে উত্তম প্রতিদান এবং বাতিলপন্থীদেরকে মন্দ বদলা দিবেন।

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰي شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاۗءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

১৮. তারপর আমরা আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি দ্বীনের বিশেষ বিধানের উপর; কাজেই আপনি তার অনুসরণ করুন। আর যারা জানে না তাদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করবেন না।

شَرِيعَة শরীয়তের আভিধানিক অর্থ হলঃ রাস্তা, ধর্মাদর্শ, বিধান এবং নিয়ম-পদ্ধতি। রাজপথ বা 'মেনরোড'কেও شَارِع 'শারে' বলা হয়। কারণ, তা গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দেয়। তাই শরীয়ত বলতে এখানে সেই দ্বীনের বিধানকে বুঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। যাতে মানুষ সে পথে চলে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে পারে। আয়াতের অর্থ হল, আমি তোমাকে একটি সুস্পষ্ট রাস্তায় বা তরীকায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছি, যা তোমাকে সত্য পর্যন্ত পৌঁছে দেবে।

اِنَّهُمْ لَنْ يُّغْنُوْا عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْـــًٔا ۭ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاۗءُ بَعْضٍ ۚ وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِيْنَ

১৯. নিশ্চয় তারা আল্লাহ্‌র মুকাবেলায় আপনার কোনই কাজে আসবে না; আর নিশ্চয় যালিমরা একে অন্যের বন্ধু; এবং আল্লাহ মুত্তাকীদের বন্ধু।

এই আয়াত এবং এর আগের আয়াতে যা বলা হয়েছে, তা ইসলাম দাওয়াতের মশালবাহীদের পথনির্দশনা করছে। এখানে যা কিছু বলা হয়েছে, তারপর আর কিছু বলার প্রয়োজন থাকে না।

অর্থাৎ আল্লাহর শরীয়ত এক ও অভিন্ন । মানবজাতির জন্যে এই শরীয়তই একমাত্র মনোনীত জীবন বিধান। এর বাইরে যা কিছু আছে তা সবই মনগড়া, যার উৎস হচ্ছে অজ্ঞতা । কাজেই যারা ইসলামী দাওয়াতের ধারক ও বাহক তারা এক মাত্র আল্লাহর শীরয়তেরই অনুসরণ করবে এবং অন্যান্য সকল মনগড়া মতবাদ আদর্শ ত্যাগ করবে । তারা যেন কখনও এই শরীয়ত থেকে বিচ্যুত হয়ে অন্য কোনো মতবাদের অনুসরণ না করে। কারণ যারা এসব মনগড়া মতবাদের সৃষ্টা ও ধারক, তাদের কেউ আল্লাহর হাত থেকে কাউকে রক্ষা করতে পারবে না। তবে তারা আল্লাহর শরীয়তের বিরুদ্ধে একবদ্ধ। কাজেই তাদের কাছ থেকে সাহায্য সহযোগিতা আশা করা বাতুলতা মাত্র । তারা কারো কোনো ক্ষতিও করতে পারবে না। কারণ, যারা আল্লাহর দ্বীনের ওপর টিকে থাকবে তাদেরকে আল্লাহই রক্ষা করবেন। আল্লাহর সামনে অন্য কারো কোনো ক্ষমতা নেই।

هٰذَا بَصَآئِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ

২০. একুরআন মানুষের জন্য আলোকবর্তিকা এবং হেদায়াত ও রহমত এমন সম্প্রদায়ের জন্য, যারা নিশ্চিত বিশ্বাস করে।

অর্থাৎ এই কিতাব এবং এই শরীয়ত পৃথিবীর মানুষের জন্য এমন এক আলো যা হক ও বাতিলের পার্থক্য সুস্পষ্ট করে দেয়। কিন্তু তা থেকে হিদায়াত লাভ করে কেবল সেই সব লোক যারা তার সত্যতার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে। আর তা রহমত কেবল তাদের জন্যই।

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ سَوَآءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ۭ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ

২১. নাকি যারা দুষ্কর্ম করেছে তারা মনে করে যে, আমরা জীবন ও মৃত্যুর দিক দিয়ে তাদেরকে ওদের মত গণ্য করব যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে? তাদের বিচার-সিদ্ধান্ত কতই না মন্দ!

অর্থাৎ, ইহকালে ও পরকালে উভয়ের মধ্যে যেন কোন পার্থক্য করব না। এ রকম কখনও হতে পারে না। অথবা অর্থ হল, যেভাবে দুনিয়াতে ওরা সমান সমান ছিল, অনুরূপ আখেরাতেও সমান সমান থাকবে। মরে এরাও শেষ হয়ে যাবে এবং ওরাও? না দুষ্কৃতকারীদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে, আর না বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করা হবে। এ রকম হবে না। এই জন্য পরে বলেছেন, ওদের ফায়সালা কতই না মন্দ!

ফুটনোট

➢ আল্লাহ তায়ালা গোটা সৃষ্টিজগতকে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন। কিন্তু মানুষ এজন্য আল্লাহর কৃতজ্ঞতা পর্যন্ত প্রকাশ করে না।

➢ জীবিকা অর্জনের জন্য চেষ্টা চালাতে উৎসাহিত করেছে ইসলাম। এই ধর্ম হালাল উপার্জনের মাধ্যমে জাগতিক জীবনে স্বচ্ছলতা অর্জন করতে নিষেধ করেনি।

➢ সৃষ্টিজগতের বিভিন্ন ঘটনাবলীর দিকে তাকালে আমরা আল্লাহর অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে পারি এবং আমাদের মধ্যে ঈমানের দৃঢ়তা বৃদ্ধি পায়।

➢ কাফিরদের প্রকৃতি অনুযায়ী তাদের সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন আচরণ করতে বলা হয়েছে। কখনো তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে এবং কখনো তাদেরকে আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিতে হবে যাতে তিনি তাদেরকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে পারেন।

➢ আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে আমাদের কৃতকর্ম অনুযায়ী শাস্তি বা পুরস্কার দেবেন। আর আমরা সেই কৃতকর্মের জন্য পুরস্কারের আশা করতে পারি যা আমাদের জীবনের অংশ হয়ে গেছে এবং যা নিয়মিত পালন করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

➢ মানুষের পুরস্কার ও শাস্তি তার নিজের ভালো বা মন্দ কাজের ওপর নির্ভরশীল। সব মানুষের ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার এই আইন সমানভাবে প্রযোজ্য।

➢ আল্লাহ তায়ালা মানুষের মুখাপেক্ষী নন বরং মানুষকে সৌভাগ্যশালী করার জন্যই তিনি পৃথিবীতে কুরআন পাঠিয়েছেন।

➢ আমরা যদি বস্তুগত ও আত্মিক নেয়ামতকে আল্লাহ-প্রদত্ত মনে করি এবং সেগুলোর সঠিক ব্যবহার করি তাহলে এই পৃথিবীতেই আমাদের পক্ষেও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা সম্ভব।

➢ ইসলামে নবীর জন্য শাসনক্ষমতা পরিচালনায় দোষের কিছু নেই। তবে ক্ষমতা পরিচালনার নীতি হতে হবে দ্বীনি শিক্ষা ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে।

➢ আল্লাহ তায়ালা সত্য উপলব্ধি করার জন্য মানুষের কাছে আসমানি কিতাব ও নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। কাজেই কিয়ামতের দিন কাফিররা আল্লাহর নাফরমানি করার পক্ষে কোনো যুক্তি দেখাতে পারবে না।

➢ সত্যের জ্ঞান স্পষ্ট হয়ে যাওয়াই যথেষ্ট নয়। বহু মানুষ সত্যকে উপলব্ধি করা সত্ত্বেও গোঁড়ামি, ঔদ্ধত্ব বা বিদ্বেষের কারণে তা গ্রহণ করেনি বরং সমাজে মতবিরোধ সৃষ্টি করেছে।

➢ মানুষকে হেদায়াত দান করার জন্য আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে আসমানী কিতাবসহ বহু নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। এসব বিধিবিধানের মৌলিক বক্তব্য ছিল অভিন্ন। ইসলাম হচ্ছে অতীতের সেসব বিধানের পূর্ণাঙ্গ রূপ যা বিশ্বনবী (সা.)-এর মাধ্যমে আমাদের কাছে এসেছে।

➢ যে কেউ আল্লাহর নির্দেশ পালন করে না সে নিজের বা অন্যের খেয়াল-খুশি অনুসরণ করতে বাধ্য। আর খেয়াল-খুশির অনুসরণ মানেই হচ্ছে সরল পথ থেকে বিচ্যুতি।

➢ দ্বীনের অনুসরণ করতে হবে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দিয়ে। আর তা করতে পারলেই হেদায়েতের এমন উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছানো সম্ভব যেখান থেকে একজন ঈমানদার ব্যক্তিকে টলানো সম্ভব নয়।

➢ মানুষের জীবন, মৃত্যু ও পারলৌকিক জীবনের সুখ বা দুঃখ নির্ভর করছে তার ঈমান ও কর্মের ওপর।